



বীর শহীদ সুমন মিয়া

জন্ম তারিখ:	১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৪
শাহাদাতের তারিখ:	২৩ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা
জেলা:	নরসিংদী

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এবং একজন কাঁচা সবজি ব্যবসায়ী,
শাহাদাতের স্থান : ঢাকা পিজি হাসপাতাল।

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

“ইস! গুলি খেলাম।

মরলে তো শহীদ হতে পারতাম।”

শহীদ মোহাম্মদ অহিদ মিয়া গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানায় ১৯৯৭ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: খোরশেদ এবং মাতার নাম ফুরকান বিবি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর আর পড়ালেখা করার সুযোগ পাননি মোহাম্মদ অহিদ মিয়া। এরপরই ঢুকে যান চাকরি জগতে। পোশাক কারখানার হেলপার হিসেবে নিয়োগ পান। স্বল্প বেতনে মাকে নিয়ে ভালোই বেশ ভালো চলছিল শহীদের সংসার। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, হঠাৎ তার বড় বোনের তালাক হয়ে যায়। তালাকপ্রাপ্ত বোনের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। এরপর অপারেটরের কাজ শিখে ২০২২ সালে যোগ দেন শান টেক্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে। অপারেটর হিসেবে তার বেতন ছিল ১৫ হাজার টাকা।

শহীদের পরিচয়

শহীদ সুমন মিয়ার জন্ম ২০০৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নরসিংদী জেলার খনমদী গ্রামে। তাঁর বাবা মৃত হাসেন আলী এবং মা আমিরুন বেগম। বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন সুমন মিয়া। তিনি ছিলেন একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। জামিয়া এমদাদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ১০ম শ্রেণীতে পড়তেন তিনি। শহীদ সুমন পড়াশোনার পাশাপাশি কাঁচা সবজি বিক্রয় করতেন। ২০২৪ সালের বৈশ্যম্যবিরোধী ছাত্র আলোলানে তিনি শহীদ হন।

শহীদ সুমন মিয়ার দিনকাল

ছোট বেলায় বাবা হারা এতিম সুমন মিয়ার ছিল পড়া লেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ। কিন্তু বড়ো ভাইদের উপার্জনে চলা অভাবের সংসারে লেখাপড়া যেন একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও শহীদ সুমনের মা এবং ভাইদের ইচ্ছা ছিল সুমন পড়ালেখা করুক। পরিবারের একজন অন্তত শিক্ষিত হোক। আর তাই, সকলের মনের বাসনা এক জায়গায় এসে মিলে গেলে অভাব আর দারিদ্রতা আটকিয়ে রাখতে পারেনি শহীদ সুমন মিয়ার পড়ালেখা। তিনি বহুগুণ আগ্রহ আর চেষ্টা নিয়ে নিজের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একটা পর্যায়ে তিনি নিজেই লক্ষ্য করলেন যে, এভাবে আর চলছে না। প্রত্যেকের হাড়ভাঙা খাটুনিতে যেখানে দুইবেলা খেয়ে, বৈঠে-বর্তে থাকতেই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে তিনি ঠান্ডামাথায় পড়ালেখা করবেন কিভাবে?

শহীদ সুমন তাঁর মা এবং বড়ো ভাইদের অনুমতি নিয়ে কাঁচা সবজি ব্যবসার কাজে নেমে পড়েন। ব্যবসা করেই নিজের পড়ালেখার খরচের পাশাপাশি মায়ের এবং পরিবারের কিছু খরচও চালাতেন তিনি।

শহীদ সুমন ছিলেন পরিবারের সকলের আদরের। আর তিনিও যেন সকলের না বলা কথা; প্রকাশ না করা আশা-আকাঙ্ক্ষা ঢের বুঝতে পারতেন। তাই সবার জন্যই কিছু না কিছু করার চেষ্টা করতেন। সে জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেও পিছপা হতেন না।

প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে পাইকারী বাজার থেকে কাঁচা সবজি কিনে এনে সেগুলো ধোয়া মোছা করে দোকানে সাজাতে সাজাতে বাজার গুরু হয়ে যায়। শহীদ সুমন সকাল ১০ টা পর্যন্ত বেচা-কেনা করে মাদ্রাসায় চলে যান। বিকাল ৪ টায় মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফিরে কিছু খাওয়া দাওয়া করে আবার বিকাল ৫টায় চলে যান কাঁচা সবজি বিক্রি করতে। তারপর একটানা রাত ১২ টা পর্যন্ত। এতো রাতে বাসায় ফিরে দুমুঠো খেয়ে, কখনো পড়তে বসতেন আবার কখনো ঘুমিয়ে যেতেন। আবার শেষ রাতের দিকে উঠে পড়ালেখা করতেন, নামাজ পড়তেন। সবকিছু কেমন যেন এক প্রাণোজ্জ্বল শক্তি দিয়ে সমন্বয় করে চলতেন তিনি। সোমবার ছিল তাঁদের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। অর্থ্যাৎ সেদিন তাঁরা বাজারে যেতেন না। তাই সোমবার বেশির ভাগ সময় তিনি পড়ালেখা করে কাটাতেন। বাকি সময়টা পরিবার, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদেরকে দেয়ার চেষ্টা করতেন। শহীদ সুমন একজন সদালাপি মিশুক ছেলে ছিলেন। অল্পতেই সবার সাথে মিশে যেতেন তিনি। আর এভাবেই কাটছিল অনাগত সুন্দর ভবিষ্যৎ তথা সফলতার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিনের সংগ্রামী জীবন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

শাহীদ সুমন নিয়মিত মাদ্রাসায় ক্লাস করার চেষ্টা করলেও সহপাঠী বন্ধুদের খুব বেশি সময় দিতে পারতেন না। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাঁকে একজন কঠোর পরিশ্রমী ও সৎ ছেলে হিসেবে জানতেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে শহীদ সুমন তাঁর সহপাঠীদের কাছে জানতে পারেন যে, সারাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৈশ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

শহীদ সুমন শুরুতে ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও বন্ধুরা তাঁকে বিস্তারিত বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেন। তাদের মাধ্যমে সুমন জানতে পারেন, ২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই শুরু করেছিল সেই আন্দোলন। সে বছর কুচক্রী আওয়ামী সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি ঠিকই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবার দুইজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তানকে দিয়ে হাইকোর্টে আপিল করিয়ে ছাত্রদের পক্ষে দেয়া রায়কে বাতিল করায়।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে রাজপথ থেকে ঘরে ফিরিয়ে তারপর আবার এমন মুনাক্কেফি আচরণ! সাধারণ শিক্ষার্থীরা এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তারপর নিজেদের মধ্যে আরও প্রস্তুতি গ্রহণ; আরও শক্তি সঞ্চয় করণ; অতঃপর ২০২৪ সালে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে আবার ফিরে আসা রাজপথে।

শহীদ সুমনের মনে পড়ে যায়। ৪ বছর আগের ঘটনা। ২০১৮ সালে তিনি আরও ছোট ছিলেন। তখন সহপাঠীদের সাথে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে রাজপথে নেমেছিলেন তিনি।

সহপাঠী আর বন্ধুদের সাথে দিনের পর দিন রাজপথে থেকেছিলেন শহীদ সুমন। সে বছর এই স্বৈরাচার সরকারের কাছ থেকে যৌক্তিক কিছু দাবি আদায়ে অনেক কাঠ-খড় পোরাতে হয়েছিল স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে। ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের নামেও মামলা করেছিল এই ফ্যাসিস্ট হাসিনা। কিন্তু সে বছর কারো কোন চোখ রাঙানি কাজে লাগেনি। শহীদ সুমনদের মতো ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা নিজেদের দাবি আদায় করে তারপর রাজপথ ছাড়ছিল সেই ২০১৮ সালে। সে বছর অনেক বেশি ছোট থাকার কারণে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সুমন বুঝেওনি আর কেউ তাঁকে বুঝাতেও আসেনি। তাই যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এবার তো সুমন আরও পরিপক্ব। আরও বেশি বুঝেন; বুঝার ক্ষমতাও রাখেন। আবার যেহেতু ডাক এসেছে, এবার আর ঘরে বসে থাকা যায় না। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সম্মুখে থেকে অংশগ্রহণ করবেন।

তারপর জুলাইয়ের প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান আর শিক্ষার্থীদের হার না মানা আন্দোলন। হঠাৎ ১৬ জুলাই, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর স্বৈরাচার সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলি! শহীদ হলেন রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ সারা দেশে কমপক্ষে ৬ জন শিক্ষার্থী। গর্জে উঠলো ছাত্র সমাজ; গর্জে উঠলো বাংলাদেশ আর গর্জে উঠলেন শহীদ সুমন মিয়া। সারা জীবন হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না পোষণ করা সুমন আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। ১৭ জুলাই সরাসরি যোগ দিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। তারপর ১৮ জুলাই স্বৈরাচার খুনি সরকার দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর ম্যাসাকার চালায়। সারা দেশের নিরীহ মানুষের সাথে সাথে বুক কেঁপে উঠে সম্মুখ সারিতে আন্দোলন করা সাহসী সুমনেরও। নিজের সামনে সহপাঠী আর সহযোগীদের আহত, নিহত হতে দেখেছেন তিনি। শোকে দুঃখে বুক যেন তাঁর অসহনীয় ভার হয়ে উঠে। ১৮ জুলাই রাতে রক্তপিপাসু হাসিনা ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে সারা দেশে কারফিউ জারি করে। ১৯ জুলাই শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে বন্ধুদের সাথে কারফিউ ভেঙে আন্দোলনে নামেন শহীদ সুমন। সেদিন সুমনের সাথে তাঁর ইমিডিয়েট বড় ভাই জুলহাস মিয়া আন্দোলনে গিয়েছিলেন। সেদিনও রাজপথে শতশত লাশ ফেলেছিল খুনি আওয়ামী সরকার। শহীদ সুমন তাঁর ভাইকে নিয়ে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন বাড়িতে। দুইভাই বাড়ি ফিরে আসলে তাঁদের মা আমিরুন বেগম ছেলেদের কোন প্রকার আন্দোলনে যেতে নিষেধ করে দেন।

দেশের এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখে তাঁদের মায়ের মনে ভয় বাসা বেঁধেছে বুঝতে পেরে আর ভাইদের সাথে সুমন নিজেও তাঁর মাকে শান্তনা দেন এবং তিনি আর আন্দোলনে যাবেন না বলে সেদিনের জন্য আশ্বাস দেন।

কিন্তু পরের দিন ২০ জুলাই কাউকে কিছু না বলে সুমন ঠিকই আন্দোলনে চলে যান।

ঘটনার দিন

২০ জুলাই শনিবার, দুপুর ৩ টার দিকে পরিবারের কাউকে কিছু না বলে শহীদ সুমন বন্ধুদের সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যান। কারফিউ ভেঙে তাঁরা আন্দোলন করতে চলে যান রাইনওকে মার্কেটে মাধবদী বাজার এলাকায়। সেদিন চার পাশ থেকে শত শত ছাত্র-জনতা এসে যোগ দেয় তাঁদের সাথে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত রাজ পথ। বিকাল ৫.৩০ টার দিকে হঠাৎ মাধবদী থানার খুনি পুলিশবাহিনী এসে ছাত্র-জনতার সমাবেশকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে কয়েকজন। ঘাতক পুলিশের একটি গুলি সুমনের পিঠ দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর বন্ধুরা পাশেই ছিল। কিন্তু স্বৈরাচার পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলির মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তারা।

উদ্ধার এবং হাসপাতালে ভর্তি

বেশ কিছুক্ষণ নারকীয় কাণ্ড সম্পাদন করে পালিয়ে যায় পুলিশ। তারপর বন্ধুরা এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় পাশের প্রাইম হাসপাতালে। সেখানে পরিচিত একজন সুমনের বাড়িতে খবর দেন। শহীদ সুমনের মা এই খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সাথে সাথে সুমনের ভাই জুলহাসকে ফোন করে জানান। জুলহাস মিয়া মায়ের কাছে নিজের সহদর ভাইয়ের এমন মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনে পাগলের মতো ছুটে যান প্রাইম হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ডাক্তার শহীদ সুমনকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। জুলহাস মিয়া ডাক্তারের পরামর্শে সুমনকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেয়ার জন্য এম্বুলেন্স ডাকেন। এম্বুলেন্স সুমনকে নিতে আসার সময় মাধবদী থানার সামনে আটকে যায়। পুলিশ এপাশে কোন এম্বুলেন্স যেতে দিবে না। এমনকি থানার সামনে চেকপোস্ট বসিয়ে সকল প্রকার যানবাহন হতে নামিয়ে নামিয়ে যাত্রীদের চেক করছে গুলি পুলিশ। এম্বুলেন্সের ড্রাইভার এই ঘটনা সুমনের ভাই জুলহাসকে জানায় এবং একটি সিএনজি নিয়ে পুলিশের চেকপোস্ট পার হওয়ার বুদ্ধি দেয়। আর কোন উপায় নাই দেখে রাজি হয়ে যান জুলহাস মিয়া। একটি সিএনজি ভাড়া কার সহদর আহত ভাইকে নিয়ে রওনা দেন তিনি। সিএনজি থানার চেকপোস্ট পার হওয়ার সময় পুলিশ আটকিয়ে দেয়। তারপর পুলিশ সুমনের ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি পুলিশকে একটু মিথ্যা করে বলেন-"তেনম কিছু না, একটা রাবার বুলেট লেগেছে আমার ভাইয়ের পিঠে।" এক পুলিশ সদস্য হ করেও কি মনে করে যেন ছেড়ে দিলেন। তারপর তাঁরা চেকপোস্ট পার হয়ে অপেক্ষারত এম্বুলেন্সে করে সুমনকে নিয়ে চলে যান কুর্মিটোলা হাসপাতাল।

এক ঝলক আশার আলো

কুর্মিটোলা হাসপাতালে অনেক চড়াই-উতরাই শেষে সুমনের সফল অস্ত্রোপচার হয়। তারপর আন্তে আন্তে সুমন মিয়া সুস্থতার দিকে এগোতে থাকেন। সবার সাথে কথা বলেন। খাওয়া দাওয়া করেন। মাকে শান্তনা দেন। একবার কথায় কথায় আফসোস করে বললেন - " ইস! গুলি খেলাম। মরলে তো শহীদ হতে পারতাম। "

নাড়ি ছিঁড়া ধন আদরের সন্তানের মুখে এমন কথা শুনে যেন আরও ভয় পেয়ে যান শহীদ সুমনের মা। আর যেন আন্দোলনে না যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ভাবে সুমনকে বুঝাতে থাকেন তিনি। অথচ আল্লাহ যেন শহীদ সুমনের ইচ্ছাকেই কবুল করে নিলেন।

আবার লড়াই জীবনের সাথে

কয়েকদিন পরেই সুমনের অপারেশনের জায়গায় ইনফেকশন হয়। তারপর থেকে কখনো বেড়ে কখনো আইসিইউতে রাখা হয় বাংলার বীর সুমনকে। এভাবে দিনে দিনে তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকলে কুর্মিটোলা হাসপাতাল থেকে তাঁকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ২১ আগস্ট ঢাকা পিজি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় শহীদ সুমনকে।

অবশেষে দোয়া কবুল

পিজি হাসপাতালে ভর্তি করানোর মাত্র দুই দিনের মাথায় বৈরাচারী হাসিনার বিষাক্ত কামড়ের কঠিন যন্ত্রণার সাথে লড়াই শেষে ২৩ আগস্ট সকাল ৭ টায় মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা পান করেন শহীদ সুমন মিয়া। পূর্ণ হয় তাঁর সারাজীবন হৃদয়ে লালন করা শহীদি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা।

২০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গিয়ে চরিত্রহীন পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে সুদীর্ঘ ৩৪ দিন জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মায়ের অতি আদরের সন্তান শহীদ সুমন এবার নিজের নাম লেখালেন শহীদি মিছিলে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল অস্ত্রত একজনকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার একটি সম্মিলিত পারিবারিক স্বপ্ন।

শহীদের দাফন কাফন

পিজি হাসপাতাল হতে শহীদের লাশ এনে তাঁর বর্তমান বসবাসের এলাকা সিদ্দিক বাজার চায়না মিলের মাঠে বাদ যোহর হাজারো মানুষের- উপস্থিতিতে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

আর দ্বিতীয় জানাজা হয় বিকাল ৩ টায় গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ মাঠে। সেখানে শহীদের আত্মীয় স্বজনসহ হাজার হাজার জনতার শোকাক্ত কান্না আকাশ বাতাস ভারি কার তোলে। অতঃপর গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ কবরস্থানেই দাফন করা হয় জুলাই বিপ্লবের অন্যতম নায়ক শহীদ সুমন মিয়াকে।

পরিচিত জনের মন্তব্য

শহীদ সুমন মিয়ার ব্যাপারে তাঁর বন্ধু, পাড়াপ্রতিবেশী ও পরিচিতজনদের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা জানান, শহীদ সুমন একজন ভালো ছেলে হিসেবে ঘরে বাইরে ছিলেন পরিচিত মুখ। তিনি কখনো কারো সাথে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদে জড়াতেন না। তার ব্যাপারে এলাকায়, কর্মস্থলে, মাদ্রাসায় কারো কোন অভিযোগ নেই। তিনি সর্বদা একজন হাসিখুশি, সদালাপি ছেলে ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করলেও তাঁর চেহারায় কখনো বিরক্তি বা ক্লান্তির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। বড়ো পরহেজগার ছিলেন তিনি। সকলের বিপদে আপদে সব সময় ছুটে যেতেন শহীদ সুমন।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ সুমন মিয়া ছিলেন তাঁর বাবা মারের পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবার ছোট। পরিবারে মা ছাড়াও তাঁর আরও চার ভাই এবং তাদের স্ত্রী-সন্তান আছে। শহীদ সুমনের মা আমিরুন বেগম (৫৫) একজন গৃহিণী। সবার বড়ো ভাই মোঃ সুলেমান (৩৫) কাঁচা সবজির ব্যবসা করেন। তাঁর পরের ভাই আক্তার হোসেন (৩০) মালয়েশিয়া প্রবাসী। পরের ভাই মাম্মা মিয়া (২৮) একজন রিকশা চালক। তারপরের ভাই জুলহাস (২৫)। তিনিও কাঁচা সবজির ব্যবসা করেন।

প্রস্তাবনা

শহীদ সুমনের পরিবারের সবাই ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তাদের নিজস্ব কোন বাড়ি নাই। পড়াশোনা ও ব্যবসার কাজে শহীদ সুমন বিভিন্ন সময় ঋণ করেন। বর্তমানে তাঁর মোট ঋণের পরিমাণ ১২০০০০ টাকা। বৃদ্ধ মায়ের আয়ের কোন উৎস নেই। শহীদ সুমন মায়ের দেখাশোনা করতেন। এমতাবস্থায় এই শহীদ পরিবারের জন্য একটা স্থায়ী বাড়ি করে দেয়া; শহীদের ঋণ পরিশোধ করা এবং ভাইদেরকে স্থায়ী কোন ব্যবসা বা দোকান করে দেয়া রাষ্ট্র, সরকার এবং আমাদের সকলের জন্য বিবেচ্য বিষয় হতে পারে।

একনজরে শহীদ সুমন মিয়া

পূর্ণ নাম : সুমন মিয়া

জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ মৃত্যু : ২৩ আগস্ট ২০২৪ জন্মস্থান : খনমদী, মাধবদী, নরসিংদী

পেশাগত পরিচয় : একজন ছাত্র, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। এবং একজন কাঁচা সবজি ব্যবসায়ী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : জামিয়া এমদাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা

বর্তমান ঠিকানা : বদের কামরা। মশিগুরা, সিদ্দিক বাজার, মাধবদী, নরসিংদী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- খনমদী, ১২ নং ওয়ার্ড, মাধবদী, নরসিংদী

পিতার নাম : হাসেন আলী (মৃত)

মাতার নাম : আমিরুন বেগম

শহীদ পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ০৫

প্রথম আন্দোলনে যোগদান : ১৭ জুলাই ২০২৪

ঘটনার দিন : ২০ জুলাই, রাইনওকে মার্কেট, মাধবদী

আহত হওয়ার সময় ও স্থান : ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫.৩০, রাইনওকে মার্কেট

আঘাতকারী : ঘাতক পুলিশবাহিনী, মাধবদী থানা

শাহাদাতের সময় ও স্থান : ২৩ আগস্ট ২০২৪, সকাল ৭টা, ঢাকা পিজি হাসপাতাল

প্রথম জানাজা : ২৩ আগস্ট ২০২৪, বাদ যোহর, সিদ্দিক বাজার চায়না মিলের মাঠ

দ্বিতীয় জানাজা : ২৩ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩ টা, গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ

শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ কবরস্থান, মাধবদী, নরসিংদী

পবিত্র কুরআনের বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জাম্বাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। (সূরা তাওবা ৯:১১১)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

